Monthly
UTTARAN
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুখপত্র

উত্তরণ

ডিসেম্বর ২০২০

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

অন্য আলোকে জাতির জনক

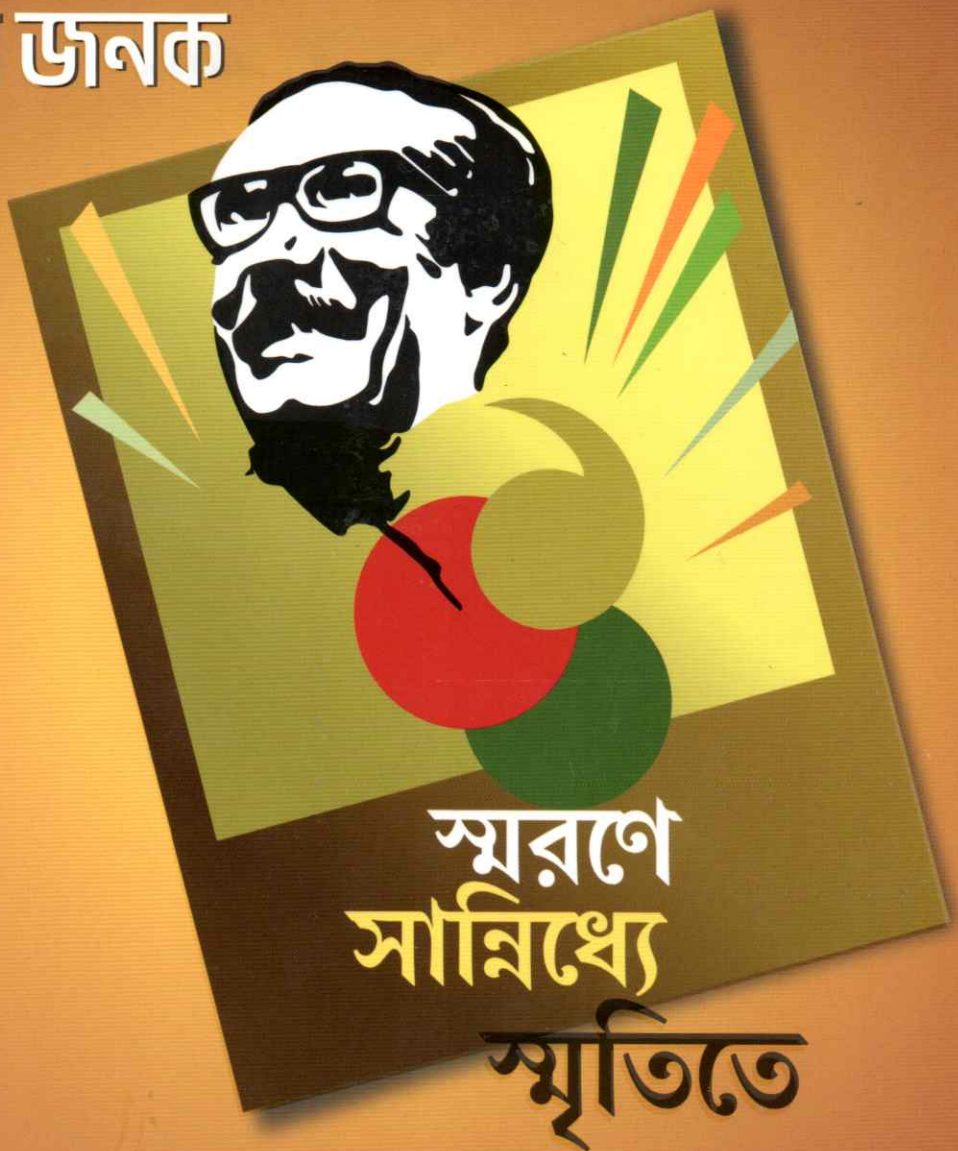

স্মরণে সান্নিধ্যে স্মৃতিতে

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির

সান্নিধ্যের স্মৃতিকথা

মো. রশিদুল আলম

মহান বিজয়ের মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাই সকল মুক্তিযোদ্ধাসহ স্বাধীনতার স্বপক্ষের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ ও দুই লক্ষ সম্ভ্রমহারা মা-বোনদের প্রতি। শ্রদ্ধা জানাই ১৫ আগস্ট নৃশংস হত্যাকাণ্ডে নিহত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যদের প্রতি।

গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, অসহায়-অবহেলিত-শোষিত-বঞ্চিত-গরিব-দুঃখী মানুষের শেষ ভরসাস্থল, মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পতাকাবাহী প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার প্রতি।

তিনি আরও বললেন, "তোমাদের কাছে অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা কিছু আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।" একই সাথে তিনি প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক মহল্লায় মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলার নির্দেশ দিলেন। বললেন, "তোমাদের

যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবে।" পাকিস্তানি সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদেরকে কেউ কিছু বলবে না।" আর যদি একটি গুলি চলে তবে হুকুম রইল, তোমাদের কাছে যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবা। বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশনা পাওয়ার পর ২৬ মার্চ থেকে অন্যান্যদের সাথে আমিও মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

পারিবারিকভাবেই আমরা রাজনীতি সচেতন ছিলাম। আমার পিতা সরকারি চাকরিজীবী হওয়া সত্ত্বেও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধুর অনুসারী ছিলেন। বড় ভাই রবিউল আলম পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং আওয়ামী সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। তিনি যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ফজলুল হক মণির ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন।

১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে ১নং আসামি করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। তাকে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে শুরু হয় ক্যামেরা ট্রায়াল। আমরা আন্দোলনকে অপ্রতিরোধ্য করে গড়ে তোলার জন্য গড়ে তুলি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ৬-দফাভিত্তিক ১১-দফা কর্মসূচি প্রণীত হয়। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি মাস থেকে ১১-দফা আদায় ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে সৃষ্ট ছাত্র-গণ-আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়।

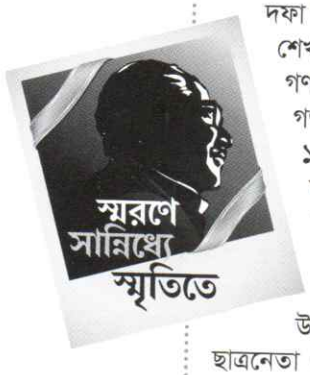

গণ-আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত আইয়ুব সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ সকল বন্দিকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়। পরবর্তীতে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখো জনতার উপস্থিতিতে সাবেক ডাকসুর ভিপি সংগ্রামী ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

চলমান পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে একটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানের বেসামরিক শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লে তিনি ২৫ মার্চ পাকিস্তানের শাসনভার সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়।

১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের সময়ে আমি গণ-আন্দোলনের একজন সক্রিয় সংগঠক ছিলাম। একাধারে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক হল কমিটির সভাপতি ও ছাত্র সংসদের নির্বাচিত জিএস। আন্দোলনের সকল জাতীয় কর্মসূচিগুলোতে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। এ-সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দালাল ছাত্র-সংগঠন এনএসএফ ক্যাডারদের সন্ত্রাসী তৎপরতা। একদিকে রাজপথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ইপিআর, অন্যদিকে এনএসএফ-এর সন্ত্রাসী তৎপরতা। এসব মোকাবিলা করেই আন্দালন সংগ্রাম করতে হয়েছে। ফজলুল হক হলে আমার কক্ষসহ ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের কক্ষে একাধিকবার অগ্নিসংযোগ করে এনএসএফ।

১৯৭১ সালের মার্চে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করেন। সেই সময় প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যেতাম। বঙ্গবন্ধু আমাদের পরবর্তী করণীয় বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিতেন। তিনি আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন। একই সাথে হল ছেড়ে প্রত্যেকের নিজস্ব এলাকায় গিয়ে স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন। আমরা বললাম, "আপনাকে ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না।" বঙ্গবন্ধু বললেন, "ওরা কত হিংস্র তা তোরা জানিস না, ওরা আমাকে না পেলে আমার ৭ কোটি বাঙালিকে হত্যা করবে।" তখন আমাদের অনেকেই বললেন আমরা কোথায় যাব। বঙ্গবন্ধু বললেন, "আমি সব ব্যবস্থা করেছি, সময়মতো সব বুঝতে পারবি।" সত্যিই পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আমরা বুঝতে পারি বঙ্গবন্ধু কী ইঙ্গিত করেছিলেন। যুদ্ধের সমস্ত প্রস্তুতিই তিনি সম্পন্ন করে রেখেছিলেন। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ ইকবাল হলের ক্যাফেটরিয়ায় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশক্রমে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নীলনকশা শুরু করায় বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ অসহযোগের ডাক দেন। তিনি ঘোষণা করেন, হরতাল চলবে, কেউ অফিস আদালতে যাবেন না, কিন্তু মাস শেষে বেতন নিবেন, কেউ কোনো ট্যাক্স দিবেন না। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে কার্যত সব কিছু পরিচালিত হতে থাকে একটি প্যারালাল গভর্মেন্টের অধীনে।

এদিকে ২ মার্চের হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে দুজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিন্দা জানান এবং ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন আধাবেলা হরতাল এবং ৭ মার্চ বেলা ২টায় রেসকোর্স ময়দানে জনসভার ঘোষণা দেন। ৭ মার্চ টিএসসি থেকে কার্জন হল পর্যন্ত শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল আমাদের ওপর। আমরা বিভিন্ন হল থেকে মশারির স্ট্যান্ড, লাঠিসহ সেদিন উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করেছি। সভাস্থলে পৌঁছতে বঙ্গবন্ধুর বিলম্ব হয়েছিল। চারদিকে গুজব রটল সভাস্থলে আসার পথে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হবে। সব কিছু তুচ্ছ করে বীরদর্পে সভামঞ্চে আরোহণ করলেন বঙ্গবন্ধু।

লাখো জনতার স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত হতে লাগলো তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান, বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু'। বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ৭ মার্চের এই ঐতিহাসিক ভাষণটিই ছিল মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা ও রূপরেখা। একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন, সেটা হলো– 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' স্লোগানটি নিয়ে। আমরা যদি শুধু বাংলা কিংবা পূর্ব বাংলা স্বাধীনতার দাবি করতাম, তাহলে পাকিস্তানিরা বলত দুই বাংলা মিলেমিশে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। ফলে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবাহিত পদ্মা-মেঘনা-যমুনা নদীগুলোর সাথে আমাদের অস্তিত্বের যে বন্ধন তাকে যুক্ত করে স্লোগান

তৈরি করা হয়েছিল, যা এই ভূখণ্ডের পরিচয় বহন করে।

১৬-২৪ মার্চ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক চলে। বঙ্গবন্ধু ৬-দফার প্রশ্নে কোনোরূপ ছাড় দিতে রাজি হননি। ২৩ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান দিবসে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করে। রাতেই শুরু হয় 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ভয়াবহ নিধনযজ্ঞ। হানাদার বাহিনী ট্যাংক ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে এক রাতেই ঢাকায় ঘুমন্ত অর্ধলক্ষাধিক বাঙালিকে হত্যা করে। রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পিলখানা ইপিআর সদর দপ্তর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমগ্র ঢাকা শহরে হত্যাযজ্ঞ চালানো, পাশাপাশি অগ্নিসংযোগ করে তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষককে নির্মমভাবে হত্যা করাসহ বিভিন্ন হলে নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। জগন্নাথ হক ও জহুরুল হক হলের অনেক ছাত্রকে ঠাণ্ডা মাথায় নির্বিচারে হত্যা করে। রোকেয়া হলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং ছাত্রীদের গুলি করা হয়।

২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপন ওয়্যারলেস বার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ রাত ১টা ১০ মিনিটে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসভবন থেকে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে এবং পরে গোপনে তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে বঙ্গবন্ধুকে আটক রাখা হয়। উল্লেখ্য, তার কারাকক্ষের পাশে কবর খোঁড়া হয়েছিল। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপস করেননি।

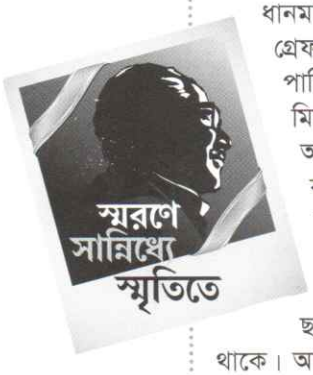

৭ মার্চের পর বঙ্গবন্ধুর দিক-নির্দেশনা মোতাবেক ছাত্ররা ধীরে ধীরে হল/ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে থাকে। আমরা সড়ক পথে পাবনা পৌঁছাই এবং পাবনার ছাত্রনেতাসহ আওয়ামী লীগ নেতা ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও পাবনা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি আমজাদ হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ করি। পাবনা ও ঈশ্বরদীতে একাধিক পথসভায়, শ্রমিক সমাবেশে বক্তব্য রাখি। ঈশ্বরদী রেলওয়ে স্টেশন ও ভেড়ামারা ডাকবাংলোতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়াই।

১৯৭১-এর উত্তাল মার্চ। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মার্চ মাসজুড়েই বাঙালিদের হত্যাসহ নানান প্রক্রিয়ায় বাঙালি নিধনে নামে। চট্টগ্রাম, পার্বতীপুর, সৈয়দপুর, ঈশ্বরদী, পাকশী, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবাঙালিরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহায়তায় হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হয়। ২৪ কিংবা ২৫ মার্চ পাকশীতে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলি। পাবনা ও রাজশাহী থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গুলি করতে করতে ঈশ্বরদী দখল করে পাকশীতে প্রবেশ করে। আমার বাবা এ-সময়ে রেলওয়েতে চাকরি করতেন। পাকশী আবাসিক এলাকায় একটি বাসায় বাবা-মা'সহ পুরো পরিবার বসবাস করতেন। পাকহানাদার বাহিনী পাকশীতে প্রবেশ করে প্রথমে বাবার বাসাটি বোমা মেরে পুরো বাড়িটি উড়িয়ে দেয়। কোনোরকমে আমার পরিবারের সদস্যগণ প্রাণে বেঁচে যান। পায়ে হেঁটে মাঠঘাট পাড়ি দিয়ে, নৌকায় পদ্মা নদী পার হয়ে, ভেড়ামারা-দৌলতপুর হয়ে শিকারপুর শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নেন বাবা-মা'সহ পুরো পরিবার। সেখানে কিছুদিন তারা শরণার্থী শিবিরে ছিলেন। কয়েক মাস পর করিমপুর শরণার্থী শিবিরের পাশে একটি ভাড়া বাড়িতে ওঠেন। পাকশীতে বসবাসরত বাড়িতে হামলার পর আমার বাবা-মা'সহ তিন বোন এবং কিশোর বয়সী দু-ভাই মো. রফিকুল আলম চুন্নু ও মাহবুব-উল-আলম হানিফকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের শিকারপুরে আশ্রয় নেন। শরণার্থী শিবিরে পরিবারের সকল সদস্যগণ অসহায় মানুষের সেবায় কাজ করেছেন। আমি তখনও জানতাম না, আমার বাবা-মা ভাই-বোনেরা বেঁচে আছে কি না? পাকিস্তানি হানাদাররা প্রতিহিংসাবশত পুরো পরিবারকেই নির্মূল করতে চেয়েছিল। এমনকি গ্রামের বাড়িটিও পুড়িয়ে দেয় তারা।

পরবর্তীতে আমি একটি মিশনারিতে বাবা-মা, ভাই-বোনসহ আশ্রয় নিয়েছিলাম। অতি কষ্টে গাদাগাদি করে কয়েকটি দিন সেখানে কাটিয়েছি। এ-সময়ে ছাত্রনেতা তোফায়েল ভাই, রাজ্জাক ভাই ও বঙ্গবন্ধুর বড় বোনের বড় ছেলে ইলিয়াস চৌধুরীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলোচনা হতো। তৎকালীন ছাত্রনেতা মুজিব বাহিনীর অন্যতম সংগঠক আবদুর রাজ্জাক ভাই ত্যাগী ছাত্রলীগের কর্মীদের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রেরণ করতেন।

ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত দেরাদুন সামরিক প্রশিক্ষণ একাডেমিতে প্রথম ব্যাচে আমি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দেরাদুনের সামরিক একাডেমিতে আমরা তিন মাস ট্রেনিং গ্রহণ করি। সে-সময় বিশ্বের দুই পরাশক্তি আমেরিকা ও রাশিয়ার যুদ্ধের কলাকৌশল ভিডিওতে দেখানো হতো। প্রশিক্ষণের সমাপনী দিবসে মুজিব বাহিনীর প্রধান শেখ ফজলুল হক মণি এক নাগাড়ে ৪০ মিনিট আমাদের উদ্দেশ্যে ইংরেজিতে বক্তৃতা করেন। তার এই বক্তৃতায় আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্যসহ যুদ্ধের মাঠে করণীয় যাবতীয় নির্দেশনা ছিল। অতঃপর আমাদের নিজ নিজ জেলার নিকটবর্তী ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে অস্ত্রশস্ত্রসহ দেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ করে। আমি কুষ্টিয়া জেলা মুজিব বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে আমরা পাকবাহিনীর সাথে সরাসরি সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হই। একাধিক স্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গাড়িবহরে অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদের পর্যুদস্ত করি। কমান্ডার এবং গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা কেটেছে যুদ্ধের মাঠে, খেয়ে না-খেয়ে। চোখের সামনে সাথী যোদ্ধাদের হারিয়েছি।

বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থনের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন এবং রাষ্ট্রনেতাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন একটি সম্মানজনক সমাধান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য তিনি বিশ্বনেতাদের কাছে বারবার সহযোগিতা চেয়েছেন, যা সত্যিই আমাদের গভীরভাবে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে।

পাক-সেনাবাহিনীর বেপরোয়াভাবে বাঙালিদের হত্যাযজ্ঞ

দেখে ১৯৭১ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে মুক্তিকামী সাধারণ জনগণের মাঝে উৎকণ্ঠা লক্ষ করি। দীর্ঘদিন ধরে চলা মুক্তিযুদ্ধের ফলে অনেকেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। আমি বিষয়টি ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের ভারতীয় সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের অবহিত করি। তারা আমাদের আশ্বস্ত করে বলেন, "তোমরা জনগণকে একটু ধৈর্য ধরতে বলো। নভেম্বরে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত হামলা শুরু করা হবে।" এর কিছুদিনের মধ্যে ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধ প্রস্তুতি লক্ষ করি। ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংকার তৈরি করে সেখানে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ মজুদ করছে। মাইলের পর মাইল পরিখা খনন করে। পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ে আমাদের সাথে শামিল হতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি দেখে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা আরও বেগবান হয়ে যুদ্ধ শুরু করে।

৩ ডিসেম্বর পাক-হানাদার বাহিনী ভারতে আক্রমণ করে, সেই সময় কলকাতায় ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। আক্রমণের খবর পেয়েই তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং পরবর্তীতে দিল্লি থেকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, ভারতের লোকসভায় একটি বিবৃতি দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন।

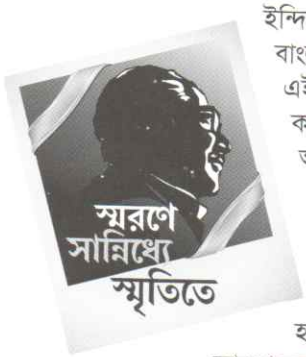

এই স্বীকৃতি প্রদানের খবরটি মুক্তিবাহিনীর মনোবল কয়েকশ' গুণ বৃদ্ধি করে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমরা কুষ্টিয়ার দৌলতপুর, মিরপুর এবং ভেড়ামারা এলাকার সকল স্থান শত্রুমুক্ত করে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনি। ৮ ডিসেম্বর আমরা ভেড়ামারা থানা দখল করে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করি। রাজশাহী ও ঈশ্বরদী থেকে আগত পাক-হানাদারদের বহনকারী ট্রেন লাইনচ্যুত হয় এবং জানমালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। ৯ ডিসেম্বর সকালে আমরা কয়েকভাগে বিভক্ত হয়ে একটি অংশ জিকে বিদ্যুৎকেন্দ্রের দিকে অবস্থান নেই। আর একটা অংশ আমার নেতৃত্বে সরাসরি পাকিস্তান বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ সময় ভারতীয় বিমানবাহিনী আমাদের কভারেজ দেয়। যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা গুলি করতে করতে অগ্রসর হতে থাকি এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বহু সদস্যকে পর্যুদস্ত করি। দুপুর ১২টার দিকে মুহুর্মুহু গুলি আসতে থাকে। মাথা ঘেঁষে চলে যায় একটার পর একটা গুলি। এ-সময়ে বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধা শহিদ হন। গোলাগুলি চলাকালে আমি গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হই। সহযোদ্ধারা গামছা পেঁচিয়ে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করে। এ-সময়ে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করি। আমাকে প্রথমে রিকশা, মোটরসাইকেল ও ছাত্রলীগ নেতা বারি ভাই আমাকে জিপ গাড়িতে করে সীমান্তবর্তী এলাকার ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর মিত্রবাহিনীর সহায়তায় আমাকে ভারতের কৃষ্ণনগর (আর্মি কোর হাসপাতালে) অস্ত্রপাচার করে। দু-তিন দিন পর ব্যারাকপুর আর্মি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে।

এদিকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, রেসকোর্স ময়দানে যৌথবাহিনীর নিকট জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় যুদ্ধাহত ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন মেজর হাস্যোজ্জ্বল মুখে জানালেন সেই বহু প্রতীক্ষিত ও কাঙ্ক্ষিত খবরটি। তিনি বললেন, "তোমরা স্বাধীন হয়েছো।" কিছুক্ষণ পরপরই শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে বয়স্ক বিভিন্ন বয়সী লোক সমাগমে মুখরিত হয়ে উঠল আমার চারপাশ। ফুলের মালা গলায় পরিয়ে আমাকে শুভেচ্ছা জানালো, বয়স্করা ভারতীয় রীতিতে কপালে তীলক এঁকে আশীর্বাদ করল। আমার দুচোখ বেয়ে অঝোর ধারায় পানি গড়িয়ে পড়ল। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন, আর আমি যুদ্ধাহত হয়ে হাসপাতালের বিছানায়। বিজয়ের এ আনন্দ দেশবাসীর সাথে ভাগাভাগির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে পাক-হানাদারদের বুলেট।

১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করবেন জানার পর বঙ্গবন্ধুকে এক নজর দেখার জন্য মন ছটফট করছিল। আমার আগ্রহে ও অনুরোধে ব্যারাকপুর সামরিক হাসপাতালে বন্ড সই করে আমার চাচাতো ভাই প্রকৌশলী তাহের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই আমাকে দেশে এনে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করেন।

বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর ঢাকা স্টেডিয়ামে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তখনও আমার হাত প্লাস্টার করা, শরীর খুব দুর্বল। জেলাওয়ারি অস্ত্র সর্মপণ করেন জেলা কমান্ডারবৃন্দ। এজন্য সারিবদ্ধভাবে আলাদা লাইন করে প্রতি জেলার জন্য প্লাকার্ড স্থাপন করে। কুষ্টিয়া জেলা কমান্ডার হিসেবে আমি যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পায়ের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করি, সে-সময় শেখ ফজলুল হক মণি ভাই ও আবদুর রাজ্জাক ভাই বলেন, "রশিদ, রশিদ গুলি খেয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এসেছে।" আমার এক হাত প্লাস্টার করা অন্য হাতে অস্ত্র। জীবিত বঙ্গবন্ধুকে কাছে পেয়ে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। বঙ্গবন্ধু চোখ মুছে দিয়ে বলেন, "তোরা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে গিয়েছিলি, দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন শক্ত হতে হবে, দেশকে গড়তে হবে।" ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, এটিই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। বঙ্গবন্ধুর ডাকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আল্লাহর রহমতে গুলিবিদ্ধ হয়েও প্রাণে বেঁচে আছি। জাতির পিতার পায়ের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করতে পেরেছি। এর চেয়ে বড় কিছু নেই। এই স্মৃতি আমার কাছে সব সময় অম্লান হয়ে থাকবে। আমার স্বার্থকতা হলো আমি বেঁচে আসায় স্বাধীন বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখতে পেলাম। তার ডাকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আমার পুরো পরিবারই মুক্তিযুদ্ধের সময় নানাভাবে কাজ করেছে। বড় ভাই রবিউল আলম দেশের বাইরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সংঘটিত করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে আমার পিতা-মাতাসহ পরিবারের সকল সদস্য শরণার্থী শিবিরে বিভিন্ন কাজ করেছেন।

উল্লেখ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ডসহ কিছু সমাজতান্ত্রিক দেশ যুদ্ধোত্তর মুক্তিযোদ্ধাদের সুচিকিৎসা প্রদানের মহান উদ্যোগ গ্রহণ করে। ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসারত অবস্থায় বিশেষ বিমানে আমাকে রাশিয়া নেওয়া হয় এবং মস্কো সিটো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমার

পা থেকে হাড় সংগ্রহ করে বিধ্বস্ত বাম হাতে স্টিল প্লেট দিয়ে তা প্রতিস্থাপন করা হয়। প্রায় দীর্ঘ তিন মাস চিকিৎসা শেষে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করি।

১৯৭২ সালে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে রেলওয়ে ক্যাডারে চাকরিতে যোগদান করি। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশাসন ক্যাডারে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট/ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে যোগদান করি। বৃহত্তর পরিসরে জনসেবা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা-মিরপুর আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রার্থী হিসেবে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করি। বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য হওয়ার কারণে উক্ত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু আমার চাকরিতে যোগদানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন এবং বলেন, "দেশ গড়ার জন্য তোদের মতো আত্মত্যাগী কর্মীর প্রয়োজন আছে। সরকারি চাকুরির মাধ্যমেও দেশসেবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়। ইনশাল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে সময়মতো এমপি হবার সুযোগ পাবি।"

স্বাধীনতার পরবর্তী দিনগুলোতে অসংখ্যবার বঙ্গবন্ধুর সাহচর্যে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে-সময় তার প্রতিটি আদেশ-নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। মনোনয়নের জন্য সাক্ষাৎকারকালে বঙ্গবন্ধুর উপদেশ-পরামর্শ-আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করে চাকরিতে মনোনিবেশ করি।

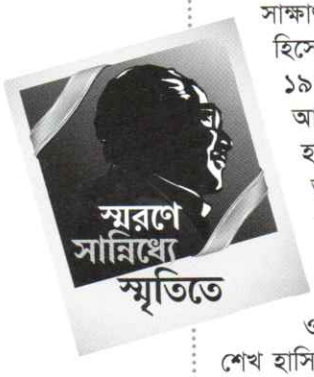

১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত সাহেবের তৃতীয় কন্যা হাবিবুন্নেছার সাথে আমার বাগদান সম্পন্ন হয়। আবদুর রব সেরনিয়াবাত সে-সময় বাংলাদেশের পানিসম্পদ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী ছিলেন। উক্ত বাগদান অনুষ্ঠানে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব উপস্থিত থেকে আমাকে এনগেজমেন্ট রিং পরান ও দোয়া করেন। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে জননেত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত হয়ে আমার সহধর্মিণীর গায়ে হলুদ দেন। ১৯৭৪ সালের ২ জানুয়ারি অফিসার্স ক্লাবে শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। বঙ্গবন্ধু ও বেগম মুজিব উভয়ই উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমাদের আশীর্বাদ করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে জাতীয় জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার তিন-চার মাস পূর্ব হতে কানাঘুষা চলছিল বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে, বঙ্গবন্ধু সরকারকে ঘিরে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। এমনকি তাকে হত্যার পরিকল্পনাও আছে ষড়যন্ত্রকারীদের। ক্যান্টনমেন্টে বসবাসরত একাধিক কর্মরত কর্মাচারী-কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানতে পারি খন্দকার মোশতাক প্রায়ই ক্যান্টনমেন্টে জিয়াউর রহমানের সাথে দেখা করতেন। বিষয়টি আমি শেখ ফজলুল হক মণি ভাইকে অবগত করি। যে জাতির মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু জীবনের ১৪টি বছর কারাগারে কাটিয়েছেন, এখন দেশের উন্নয়নে দিন-রাত কাজ করছেন, সেই দেশে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না, এটিই ছিল তার দৃঢ় বিশ্বাস। ফলে তিনি সরকারি বাসভবনের পরিবর্তে স্মৃতিবিজড়িত ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের তার নিজস্ব সাধারণ বাড়িটিতেই বাস করতেন। দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাকে সতর্ক করলেও তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি। আবদুর রব সেরনিয়াবাত সাহেবও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুকে অনেকবার বলেছেন এবং তার নিরাপ জোরদার করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এমনকি কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো এবং ভারতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও তাকে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সত করেছিলেন। কিন্তু তিনি সে-সকল সতর্ক বার্তা আম নিতেন না।

১৪ আগস্ট ১৯৭৫, আবদুর রব সেরনিয়াবাত সাহেবে মাতার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তার মিন্টু রোডের সরকা বাসভবনে মিলাদের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় মি মাহফিলে বেগম মুজিব, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শে রাসেলসহ ফজলুল হক মণির পরিবারের সদস্যগণ উপস্থি ছিলেন। প্রতি বছরের ন্যায় সেবারও মিলাদ মাহফি গৌরনদীর গ্রামের বাড়িতে আয়োজন করা হয়েছি নদীপথে যাত্রার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে মালামাল উঠা হয়েছিল। কিন্তু সেরনিয়াবাত সাহেবের পিআরও খন্দকা মোশতাকের আত্মীয় তাজুল ইসলাম তাকে অবহিত কর যে, আগামীকাল অর্থাৎ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ ম মহোদয়ের সাথে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষা জন্য গৌরনদী সফর পরিত্যাগ করেন এবং ১৫ আগ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের উদ্দে ছিল তাকে ঢাকায় আটকিয়ে রাখা। এর মাধ্যমে এই জঘ হত্যাকাণ্ডে আমেরিকার সংশ্লিষ্টতা স্পষ্ট হয়েছিল।

ষড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভ্রাতা শেখ নাসেরের খু গমন স্থগিত করে ঢাকায় তার অবস্থান নিশ্চিত ক হয়েছিল। ঐদিন সন্ধ্যায় মিন্টু রোডের বাড়ির নিচতলায় আমরা মিলাদ মাহফিলে তখন শেখ রাসেল, আরিফ, সু বাবু, শেখ পরশ, শেখ তাপস-সহ শিশুরা দ্বিতীয় তলা খেলাধুলায় ব্যস্ত। এ শিশুগুলো তখনও উপলব্ধি কর পারেনি যে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাদের জন্য মর্মান্তিক পরিণতি অপেক্ষা করছে! ঐ রাতেই শেখ তাপ শেখ পরশের পিতা শেখ ফজলুল হক মণি এবং অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী বেগম আরজু মণি ঘাতকদের বু শাহাদাতবরণ করেন। ঘাতকরা নির্মমভাবে হত্যা করে রাসেল, আরিফ সেরনিয়াবাত ও সুকান্ত বাবুকে। মি মাহফিল শেষ হলে আত্মীয়স্বজন সকলে আমাকে ও স্ত্রীকে মিন্টু রোডের বাসায় রাত্রিযাপনের জন্য অনু করেন। পরদিন আমার অফিস ছিল। তাই পরবর্তী সরকারি ছুটির দিনটা মিন্টু রোডে কাটানোর প্রতিশ্রুতি সস্ত্রীক নিজ বাসায় ফিরে আসি। ঐ রাতেই ঘাতকদের আবদুর রব সেরনিয়াবাত এবং পরিবারের আরও সদস্য শাহাদাতবরণ করেন। নিজ বাসায় ফিরে না হয়তো আমাকেও সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের শিকার হতো। ভাগ্যক্রমে বেঁচে থেকে স্বজনদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের দুঃসহ স্মৃতি বহন করতে হচ্ছে আজও। ১৫ আগস্ট ভোরে রেডিও খুলেই শুনতে পেলাম ডালিম ঘোষণা করছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে করা হয়েছে। খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃ সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। আমি স্তব্ধ ও বাক হয়ে পড়লাম। নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। মনে হচ্ছিল যেন অবাস্তব অলীক স্বপ্ন দেখছি। স্বা

বাংলাদেশের মানুষ কি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারে! দুঃসংবাদটি তখনও আমার স্ত্রীকে জানায়নি। এর কিছুক্ষণ পরই কমলাপুরস্থ রেলওয়ে আবাসিক এলাকায় অবস্থিত আমার বাসার দেয়াল টপকিয়ে, গেটের দারোয়ানদের বাধা উপেক্ষা করে আমার শ্বশুর সেরনিয়াবাত সাহেবের মিন্টু রোডের বাসার তিন গৃহকর্মী ভিতরে প্রবেশ করে। তাদের শরীর ছিল রক্তভেজা, তারা ছিল ভীতসন্ত্রস্ত, কাঁপতে কাঁপতে জানালো স্যার (আবদুর রব সেরনিয়াবাত)-সহ মিন্টু রোডের বাসার সকলকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আমার স্ত্রী দুঃসংবাদটা শুনেই অজ্ঞান হয়ে মেঝেয় পড়ে গেলেন। তখন আমার বাসায় আমার ছোট বোন আফরোজ বেবী ও ছোট ভাই মাহাবুব-উল-আলম হানিফ আমার বাসায় ছিল। আমি শোকাহত ও স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ফোন করলে একজন পুলিশ সদস্য বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের সকলের হত্যার খবরটি জানায়। আমার ভায়রা ব্যারিস্টার তোফায়েলুর রহমান পুরান ঢাকায় বসবাস করতেন। সেখানে ফোন করে খোঁজ নিই। শোকে মুহ্যমান আমার স্ত্রীকে ওখানে তার বোনের কাছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমার ছোট ভাই ও ছোট বোনকে বাসায় রেখে পুরান ঢাকায় গমন করি এবং সেখানে আমরা অবস্থান করি।

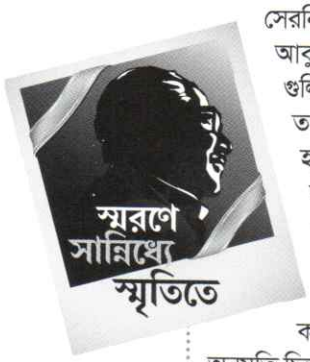

সেরনিয়াবাত সাহেবের স্ত্রী, তার কন্যা হামিদুন্নেছা বিউটি, আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর স্ত্রী, খোকন, রিনাসহ গুলিবিদ্ধ সকলকে গুরুতর জখম অবস্থায় রমনা থানার তৎকালীন ওসি পুলিশ ভ্যানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন। নিহতদের সকলকে সেনা সদস্যদের তত্ত্বাবধানে বনানী কবরস্থানে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে নিহত বঙ্গবন্ধু ব্যতিরেকে সকলের মৃতদেহ, ফজলুল হক মণি ও তার স্ত্রীর মৃতদেহের সাথে দাফন করা হয়। হাসপাতালে আহতদের কড়া নিরাপত্তার মাঝে রাখা হয়েছিল, সাক্ষাতের অনুমতি ছিল না। চিকিৎসকের পরিধেয় অ্যাপ্রোন পরিধান করে চিকিৎসক বেশে সাক্ষাৎ করতে যাই। আমার শাশুড়ি (বঙ্গবন্ধুর বোন) হত্যাকাণ্ডের দুদিন পরও জানতেন না যে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিষয়টি তাকে ঐ সময় জানানো হয়নি। ঘটনার রাতে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আবদুর রব সেরনিয়াবাত সাহেবকে রক্ষা করতে গিয়েই কন্যা হামিদুন্নেছাকে পিছন থেকে ব্রাশফায়ার করে ঘাতকরা। তার শরীরে ১১টি গুলি বিদ্ধ হয়। আরেক কন্যা বেবী সেরনিয়াবাতকে ঘাতকরা হত্যা করে। আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ কোনোক্রমে ঘাতকদের চোখ এড়িয়ে প্রাণে রক্ষা পান। তবে বড় ছেলে সুকান্ত বাবু বড় ভাইয়ের ছেলে শহিদ সেরনিয়াবাতের কোলে থাকায় ঘাতকরা তাকে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ভেবে গুলি করে হত্যা করে। পরিবারের গুরুতর আহত সকলকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পর্যায়ক্রমে ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। নিরাপত্তার অভাবে পরিবারের অধিকাংশ জীবিত সদস্য ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জননেত্রী শেখ হাসিনা তার স্বামী পরমাণুবিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ আলীর সাথে ব্রাসেলস ছিলেন। তাদের সাথে বোন শেখ রেহানাও ছিলেন। তখনও তিনি ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পুরোটা জানতে পারেননি। জার্মানির বনে নিযুক্ত বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী নিজে ড্রাইভ করে তাদের জার্মানি আনেন। নিরাপত্তাজনিত কারণেই ২৪ আগস্ট জার্মানি ত্যাগ করে ভারতে আসেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাদের ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় দেন। ৪ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে শেখ হাসিনা জানতে পারেন ১৫ আগস্ট তার পরিবারের সকলকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। কারণ তখনও তিনি জানতেন মা বেগম মুজিব ও ছোট ভাই শেখ রাসেল জীবিত আছেন। ইন্দিরা গান্ধী তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মর্মান্তিক ঘটনার পর সারাদেশে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের ওপর নির্মম অত্যাচার-নির্যাতন নেমে আসে। জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়। অনেকে জেলে, অনেকে আত্মগোপনে। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা দেশের বাইরে। দেশে যেসব আত্মীয়-স্বজন ছিলেন তাদের অনেকের জীবনই চরম অনিরাপদ হয়ে ওঠে।

সেই বৈরী সময়ে কমলাপুরের আমার বাসায় জাতির পিতার শাহাদাতবার্ষিকীতে মিলাদ মাহফিল, কোরআনখানির আয়োজন করতাম। জোহরা তাজউদ্দীন, আবদুস সামাদ আজাদ-সহ আওয়ামী লীগের নেতারা উপস্থিত থেকে দোয়া করতেন। বিভিন্ন সময়ে দলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দসহ বঙ্গবন্ধুর আত্মীয়-স্বজন, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ঐ বাসায় মিটিং করতেন। সে-সময় আমার ছোট বোন আফরোজা ও আমার ছোট ভাই, বর্তমান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম হানিফ এমপি সেসব আয়োজনে সক্রিয় সহযোগিতা করতেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আমাদের সামনে ধ্রুবতারার মতো জ্বলছেন। তিনি যে সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন, তার সেই স্বপ্ন রূপায়ণে এগিয়ে এসেছেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি কেবল পিতার অসমাপ্ত কর্তব্য সম্পন্ন করেননি, ২০২০ সালের ডিসেম্বরে দাঁড়িয়ে যে দৃশ্যমান উন্নত সমৃদ্ধ দেশকে আমরা দেখছি সেটিও জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের ফসল। শেখ হাসিনা শুধু বাংলাদেশের নেতা নন, তিনি বিশ্বনেতা। বিশ্বসভায় নিপীড়িত, নির্যাতিত, বৈষম্যের শিকার দেশসমূহের পক্ষে দীপ্ত কণ্ঠস্বর শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর মতো ঘাতকরা তাকেও বারবার হত্যা করতে চেয়েছে। শত বাধাবিপত্তি মোকাবিলা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিন-রাত নিরলস পরিশ্রম করছেন স্বাধীনতার সুফল বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে। জাতি হিসেবে আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞ। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শান্তি অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী রাখা প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। কোভিট-১৯ করোনার প্রকোপে মহামারির ফলে সারাবিশ্ব বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও জননেত্রী শেখ হাসিনার সঠিক দিক-নির্দেশনা ও কঠোরভাবে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করায় করোনার বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

লেখক : যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, সভাপতি, ছাত্রলীগ, ফজলুল হক হল শাখা; সাবেক জিএস, ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য